বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

কাজী নজরুল ইসলাম

তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদী। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনী বলে ফেলেছিলাম। এরি মধ্যে একদিন এসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন- আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবি ঠাকুর তাঁর ‘বসন্ত’ নাটক উৎসর্গ করেছেন।

আমার পাশেই দাঁড়য়েছিলেন আরো দু’একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজ-কয়েদী। আমার চেয়েও বেশী হেঁসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুবী গল্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যি সত্যিই আমার ললাটে ‘অলক্ষণের তিলক-রেখা’ এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে! কারণ এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দী বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যাঁরা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তারাই পরে সেই লেখার পনের বার করে নিন্দা করলেন। আমার হয়ে গেল বরে শাপ!

জেলের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিন্ধু ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হ’ল না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমারি অগ্রজপ্রতিম কোন কবিবন্ধু সেই সিন্ধু-মন্থনের অসুর-পক্ষ লীড্ করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দুজনেই জানতাম তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী বলে যাঁরা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে, শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি- বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার। মনে মনে কেঁদে বল্লাম, হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে!

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে, যেমন ক’রে ভক্ত তার ইষ্টদেবকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধুপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্রা-বিদ্রুপ করেছেন।

এমন কি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী কোন একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেঁসে বললেন, যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে।

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দু'চারটে কবিতা গানও শুনিয়েছি, অবশ্য কবির অনুরোধেই এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশত তাঁর অতি প্রশসংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভাল-বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সঙ্কোচে দূরে গিয়ে বসলে সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হ'ল, আমি বর পেয়ে গেলাম।

অনেক দিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না। বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন, তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচ্‌ছ- তোমাকে জন-সাধারণ একবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে- ইত্যাদি।

আমি দেখেছি, এ গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি করে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই শুভানুধ্যায়ীরা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ্‌ মিটল না। বাপ রে বাপ! মানুষের গা'ল দেবার ভাষা ও তার এত কস্‌রতও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানী রসিকতা, আর মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ-কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্‌।

বাংলায় রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির স্তূপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! ফি হপ্তায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল। এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদন্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া-রোগ-এ স্বদেশ-প্রেমের বাই উঠল। কোথায় তুই হাঁ করে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে মলয় হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি 'আয় লো অলি কুসুম-কলি' গান, -তা না ক'রে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রয়োপবেশন, পরলি শিকল-বেড়ী, ডান্ডাবেড়ী, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোন্‌ রকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুৎ!

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে সাহিত্যের বেণু-বনে এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশী অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট ছুট! যত মোলায়েম ক'রেই বেণু-বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশ-বনই হয়ে ওঠে, তা কোন্‌ পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে!

বেচারী তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্ত মহারথীর সমাবেশ! বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল! ঘন ঘন হাততালি! বলে, 'এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়।' কিন্তু, শুধুই কি সপ্ত মহারথীর মার! তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধূলো কাদা গোবর মাটি- কোনো রুচির বাছ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে।

মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আনা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামীতে সাহিত্যের বেনুবন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল!

> পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিক্‌টিকি পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙ্গা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।
>
> পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণ ভ'রে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন ক'রে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা তা কে জানত!

কপাল, কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্ত-রথীর সপ্ত প্রহরণে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি!

জানতে পালাম, আমার অপরাধ, আমি তরুণ! তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তা'রা আমার লেখার ভক্ত। সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আজ্ঞে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হ'ল?

বহু কণ্ঠের হুঙ্কার উঠলো, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাততঃ আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছিনে। ওর জন্য দু-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি!

আবার নেপথ্যে শোনা গেল, তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কতল করতে দেরী লাগবে না।

দেখাই যাক।

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতঃই এ ধোঁওয়া ছাড়িনি- না উনুনের, না সিগারেটের, ভেবেছিলাম, সম্রাটে সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেই ভাল। কিন্তু হাতিতে হাতিতে লড়াই হলেও নলখাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়ায় কোন পৌরুষ নেই।

পলিটিক্সের পাঁককে যাঁরা এতদিন ঘৃণা ক'রে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে- বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ-বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির লক্ষ্য করে না ছু'ড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য করে। কারণ, তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে! এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ ক'রে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ করে থাকি বলেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে বেছেই বাঁশ ছোড়া হচ্ছে- বাণ নয়।

অবশ্য, সে বাঁশে বাঁশীর মত গোটাকতক ফুটো ক'রে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থূলত্বই বলে, ও বাঁশী নয়- বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে দুঃখও হয়, হাঁসিও পায়। পালোয়ানী মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত বলা দুষ্কর।

আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম- যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবি-গুরু এই অভিমন্যুবধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন- এইটেই এ যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে ক'রে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় 'রক্ত'কে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপী-পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবী-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ ক'রে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানী-টুপী ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন ওরিয়েন্টাল। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তাঁরা হ'য়ে যায় 'মিঞা সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুস্কিল- তবু ও নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি ত টুপী পায়জামা শেরওয়ানী দাড়িকে বর্জন ক'রে চলেছি শুধু ঐ 'মিঞা সাহেব' বিদ্রূপের ভয়ে- তবুও নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির পেশ্‌কার উকিল মোক্তারকে কী বলব?

কবি-গুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালীকে উদ্দেশ ক'রে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে- ‘উতারো ঘোম্‌টা’ তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। ঘোম্‌টা-খোলা শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। ‘উতারো ঘোম্‌টা’ আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু ‘উতারো’ কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও-জায়গাটায়, তা ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো-শোনাবার লোভেই, ঐ একটি ভিন দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবি-গুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে দিয়ে।

খুন্‌’ আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

> আমি শুধু ‘খুন’ নয়- বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বার্গীয় অজিত চক্রবর্তীও এ-ঢংএর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন। বাঙলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী ‘জেওর’ পরালে তাঁর জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও ‘খুবসুরত’ই দেখায়।

আজকের করা-রক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তা ছাড়া যে ‘খুনে’র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায়, কালার বক্সে (colour box-এ) এবং তা খুন-করা, খুন-হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও ‘খুন-খারাবী’ হ'তে দেখি আজো এবং তা শুধু মুসলমান-পাড়া লেনেই হয় না। আমার একটা গানে আছে-

‘উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।’

এই গানটি সেদিন কবি-গুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে ‘উদিবে সে রবি মোদেরি রক্তে রাঙিয়া পূর্নবার'ও করা চল্‌ত। চল্‌ত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে ‘খুন’ শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐরকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে ‘রক্তধারা’ লিখবার, সেখানে জোর করে খুনধারা লিখি নাই। তাই বলে রক্ত-খারাবীও লিখি নাই, হয় রক্তারক্তি, না হয় খুন-খারাবী লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু তখন ওতে রাগ মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন ‘খুন’ ফোটে না, তেমনি রক্তও ফোটে না- নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে খুনা-খুনি খেলি না, কিন্তু খুন-সুড়ি হয়ত করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর আচকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য সভায় ভিড় না ক'রে হিন্দু-সভারই মেম্বার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সঞ্চয় রেখে গেলেন, তাঁর এই নূতন শব্দ-ভীতি দেখে আমরা বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর আক্রোশের পেছনে অনেক কেহ এবং অনেক কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু সাহিত্যকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জমে জমে ওঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নৈলে আরবী-ফার্সি

শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয়; এবং কবি-গুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে।

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আস্ফালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা লোকগুলোই, যারা রাত-দিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত সুন্দর মনকে নিরন্তন বিক্ষুব্ধ ক’রে তুলছে? আর, আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু।

কবি-গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ দৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ ক’রে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবি-গুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য ক’রে ওঁর আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনে।

কি ভীষণ দারিদ্রর সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়- লক্ষ্মীর কৃপায় কবি-গুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটীরে পদার্পণ করেন নি- হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ন হ’ত না তাতে- নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ। এই দীন মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন ক’রে। দেশে দেশে প্রোপাগাণ্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পতে দাঁড়াতেও লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব’সে সর্বদাই মন খুঁত খুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ ক’রে ফেলেছি! বাইরের দৈন্য অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবি-গুরুর কাছেও শুধু ঐ দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না। দীন ভক্ত তীর্থ যাত্রা করতে পারল না বলে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তা হ’লে এই পোড়া কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে!

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত-আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস করে যেন আর কাটাঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না।

কবি-গুরুর চরণে ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন- যদি আমাদের দোষত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিৎ বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে, তাঁকে তাদেরি বাহন হ’তে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায় বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন-রবিলোক- কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু উর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র শনিবারের চিঠিওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দেন আর যাই করুন, (জানি না, এ সংবাদ সত্য কিনা) ঐ দারিদ্রটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেন নি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় কঁরে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবি-লোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে পথের কুকুর’দের জন্য একটা মঠ তেরী ক’রে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘু’রে বেড়ায় যে সব হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে- ফ্রি অব্ চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, ম’রে কুকুর হয়েছে। শুনলাম, ঐ মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ঐ গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক’রে বলেছিলাম, ‘শরৎদা সত্যিই একজন মহাপুরুষ সত্যিই আমরা- সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়া-কামড়ি ক’রে মরি। তাঁর

সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।

আজ তাই একটি মাত্র প্রার্থনা, যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মাঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দু’মুঠো খেয়ে বাঁচব।

সূত্রঃ "নজরুল রচনাবলী" গ্রন্থ।

(লেখাটি ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম